**কান্টের আলোকায়ন-প্রকল্প ও তাঁর নারী-ভাবনা : একটি পর্যালোচনা**

**অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল**

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আলোকায়ন (এনলাইটেনমেন্ট) অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বিশ্ববাসীর চিন্তাজগতে যুগান্তকারী এক বিচারধারার উদ্বর্তন। আর প্রথম পর্যায়ে এই আলোকায়ন-তত্ত্বকে ইমানুয়েল কান্টের মতো এত সুস্পষ্ট ভাবে ও ভাষায় আর কেই বা তুলে ধরেছে! আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথমাংশে কান্টের আলোকায়ন তত্ত্ব পর্যালোচনা করবো, আর এর সূত্র ধরেই দ্বিতীয় অংশে আলোকায়নের প্রস্তাবক কান্টের নারী-বিষয়ক ভাবনার বিচার করবো। এখানে নারী-প্রসঙ্গ এই কারণে যে আন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমারও মনে হয়েছে নারীমুক্তি, বা অন্তত লিঙ্গ-সাম্যের ধারণা যে আলোকায়ন তত্ত্বের অন্তঃস্যূত প্রকরণ তা-ই তত্ত্বের প্রবক্তা নিজেই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন!

**১**

যদিও রিফরমেশন-রেনেসাঁর ফল্গুধারাতে মানব-চিন্তার প্রবাহ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ধিকি ধিকি সচল ছিল প্রগতির পথে, তথাপি ইমানুয়েল কান্টের মনীষা ও দর্শনে তার (প্রায়-)পূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ করি। বিশেষ করে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর স্বল্প-দৈর্ঘ্যের প্রবন্ধ “অ্যান আনসার টু দ্যা কোয়েশ্চেন: হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট?” চিন্তার জগতে বিরাট আলোড়ন সংঘটিত করে। আলোকায়ন বলতে ঠিক কী বোঝায় তা আমরা এত স্পষ্ট করে কেউই আগে আমাদের জানান নি। এর প্রভাব কতটা ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ: তাঁর প্রায় বিপরীত মেরুতে থাকা মিশেল ফ্যুকো মৃত্যুর কিছু দিন আগে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে (ঠিক দু'শো বছর পর) ঐ একই শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে কান্টের আলোকায়ন-ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছেন, যদিও তার কিছু সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেই।

আলোকায়ন-ভাবনার একবারে মূল কথা হ'ল, আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (reason)-ই সকল কর্ত্তৃত্ব তথা বৈধতার প্রাথমিক উৎস। আধুনিক বিচারধারায় যা কিছু গুরুত্ব পায়, যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বিজ্ঞান, প্রগতি, সংবিধান-বদ্ধ শাসন, ধর্ম-নিরপেক্ষতা তথা ইহজাগতিকতা--এসবের যুক্তিসিদ্ধ বৈধতা দান করেছে এই আলোকায়নের ভাবাদর্শ। সমকালের দার্শনিক ঊরগেন হ্যাবারম্যাস তো বলেই বসলেন, সংস্কারের অন্ধত্ব, কর্তৃত্বের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য, অমানবিক হিংসা--এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আলোকায়নের বিকল্প নেই। অন্যায় দমন-পীড়ন-কর্তৃত্বের প্রতিবাদী হতে এবং মানব-মুক্তির পক্ষে এগিয়ে যেতে আলোকায়নের যুক্তিঋদ্ধ মানদণ্ড আমাদের পথ দেখাতে পারে।

এবার ফিরি কান্টের কথায়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের একটি মাসিক পত্রিকা “বার্লিনিশে মোনাটসশ্রিফ্ট”-এ কান্ট একটি প্রবন্ধ “বেআন্টওয়ার্টুং ডেয়ার ফ্রাগে: ওয়াস ইস্ট আউফক্লারুং?” (ইংরেজি অনুবাদে “হোয়াট ইজ এনলাইটেনমেন্ট?” নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ) প্রকাশ করেন। যুগান্তকারী এই প্রবন্ধে আলোকায়নের মূল উদ্দেশ্য প্রথম দিকেই সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন কান্ট এই ল্যাটিন বাক্যটির মাধ্যমে: “Sapere Aude!” (উচ্চারণ: স্যাপেরে আউদে) ইংরেজি অনুবাদে, “Dare to know!”  বাংলায় ভাষান্তরিত করে বললে, তিনি বলছেন: বুঝতে, জানতে সাহস করো! আত্ম-আরোপিত অপরিপক্কতা (self-incurred immaturity) থেকে মুক্ত হও! আমরা ভীরু, আমরা কুঁড়ে। তাই নিজে কিছু করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। অন্যের সাহায্যের আশায় বসে থাকি। আমাদের ভীরুতা-জাত এই নাবালকত্ব ও কুঁড়েমি-জাত এই  পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেড়িয়ে আসার আন্তরিক আহ্বানই কান্টের আলোকায়ন-ভাবাদর্শের মূল কথা। আমাদের যুক্তি-স্বরূপ ও সক্ষমতাকে আবাহন না করে অপর ব্যক্তি তথা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার যে পথ তাই-ই আলোকায়ন। তিনি লিখছেন: “This immaturity is self-incurred if its cause is not lack of understanding, but lack of resolution and courage to use it without the guidance of another.”1 আমাদের এই কুঁড়েমি ও কাপুরুষতার কারণে অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের গৃহপালিত জন্তুর মতো চালনা করতে প্রয়াস পায়। এবং আমাদের টিকি তারা এমনভাবে ধরে রাখে যে আমরা স্বাধীনভাবে চলতে চেষ্টা করলেই তারা ভয় দেখায়। ফলে নাবালকত্ব তথা অপরিপক্কতা আমাদের উপর চেপে বসে।  মিথ্যা নাবালকত্বের এই আবরণ যখন কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে তখনই চিন্তা-চেতনার জগতে আলোড়ন শুরু হয়। শুরু হয় আলোকায়, সে বুঝতে শেখে আমাদের বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা, স্ব-অধীনতা ও মানুষের মূল্য। একই সঙ্গে নিজের (তথা নিজেদের) জন্য নিজে চিন্তা করার দায়িত্ব-কর্তব্য  সম্পর্কে  সে অবহিত হয়।

আমরা চারিদিকে কেবল শুনি: যা বলছি করো, প্রশ্ন করো না! ধর্মগুরু বলেন, যা বলছি বিশ্বাস করো, তর্ক করো না! আয়কর-আধিকারিক বলে, তর্ক করো না, পেমেন্ট করো, ইত্যাদি। এরকম পরের বুদ্ধিতে চলার অভ্যাস আমাদের অনেক, অনেক দিনের। তবে কান্ট আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, পরের নির্দেশমতো “যেমন চালাও তেমনি চলি” থেকে নিষ্কৃতি পেতে বাইরে থেকে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না, এর জন্য প্রয়োজন হয় নিজস্ব বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগ। জীবন সম্পর্কে, জগত সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে নিজস্ব বুদ্ধির স্বাধীন ও সার্থক প্রয়োগই আসলে আলোকায়ন।

কান্ট এই প্রসঙ্গে আমাদের যুক্তিবুদ্ধির দ্বিবিধ প্রয়োগের কথা বলেছেন: গণপরিসরে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ (public use of reason) আর বিশেষ পেশাগত (বা ব্যক্তিগত) পরিসরে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ (private use of reason)। সর্বসাধারণের গণপরিসরে যখন আমরা কোন বক্তব্য, কোনো দাবি তুলি তখন তার পক্ষে আমাদের স্বাধীনভাবে বিচারবুদ্ধির উন্মুক্ত প্রয়োগই হল যুক্তিবুদ্ধির গণপারিসরিক প্রয়োগ। আর যখন আমরা কেউ বিশেষ পেশার নিগড়ে থেকে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ করি তখন তা বিশেষ পেশাগত বা ব্যক্তিগত পরিসরে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ বুঝতে হবে। যুক্তিবুদ্ধির এরূপ দ্বিবিধ ব্যবহার বিবেকের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। সে প্রশ্নে আসার আগে বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কান্টের এই দৃষ্টান্তটি খুবই উপযোগী এপ্রসঙ্গে: খৃষ্টধর্মের ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন যাজক (pastor) খৃষ্টান  ধর্মসভায় বক্তব্য রাখা সহ যাবতীয় বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট  বিশ্বাসতন্ত্র অনুসারে প্রবচন দেবেন, যুক্তি সাজাবেন, কেননা তাঁকে এই বিশেষ কাজের জন্যই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সে এভাবেই কাজ করতে বাধ্য।  কিন্তু তিনি যখন এই যাজকগিরির বাইরে গিয়ে একজন শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিমানুষ হিসেবে অবস্থান করবেন তখন “...he is completely free ss well as obliged to impart to the public all his carefully considered, well-intentioned thoughts on the mistaken aspects of those doctrines, and to offer suggestions for a better arrangements of religious and ecclesiastical affairs.”2 অর্থাৎ সেই একই বিষয়ে যখন গণপরিসরে অভিমত আদানপ্রদান করবেন তখন তিনি একবারে স্বাধীনভাবে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ করবেন, যাকে কান্ট “পাবলিক ইউজ অফ রীজন” বলছেন। মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির এটাই নিয়তি, এটাই প্রগতির রাস্তা।

এখন, একই চেতনার মধ্যে আমাদের বিচারবুদ্ধি এই দু’রকমের ভিন্ন প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব? চেতনার স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তা খাপ খায় কি? এ প্রসঙ্গে কান্ট-বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, বুদ্ধি তথা প্রজ্ঞার কোন প্রয়োগ শর্তহীন নয়। কান্টের বিভিন্ন “ক্রিটিক” এ ব্যপারে পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছে। তাঁদের বক্তব্য, কান্টের এই প্রবন্ধটিকে আলাদা করে না দেখে তাঁর সামগ্রিক দর্শন, বিশেষ করে তিনটি ‘ক্রিটিক’-এর সঙ্গে যুক্ত করে পড়তে হবে। যাই হোক, এই আলোকায়ন-প্রবন্ধে কান্ট ধর্ম-বিষয়ে আরো বলছেন: “As things are at present, we still have a long way to go before men as a whole can be  in a position (or can be put in a position) for using their own understanding confidently and well in religious matters, without outside guidance.”3

অবশ্য কান্ট বলেন, ইতোমধ্যে মানুষ যথেষ্ট আলোকিত তা বলা যাবে না। তবে এইসব প্রশ্ন উঠেছে এই সময়কালেই যেহেতু উঠেছে, সেহেতু বলা বলা যায় “...our age is an age of enlightenment.”4 আসলে ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু জন লকের মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ শুরু হয়েছে তাতে করে আলোকায়নের রাস্তা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়েছে, অনেক বাধা, অনেক কুয়াশা কেটে গিয়েছে। মানুষ স্বাধীন আত্মবিশ্বাসের পথে চলতে চেয়েছে। তাই কান্ট বলছেন, আমরা আলোকায়নের যুগে রয়েছি। বস্তুত, আমরা যদি একটু গভীরে ভাবি তাহলে বোঝা যায় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক যে উদারনীতিবাদ তাই-ই কান্টের লেখনিতে এক বিশেষ তথা উন্নততর রূপে আলোকায়নের অভিধা লাভ করেছে।

মানুষের যুক্তিবুদ্ধির পূর্ণ প্রয়োগের প্রস্তাব যে কান্ট দিলেন তা সরাসরি ধাক্কা দেয় ধর্মীয় ব‍্যাপারে আমাদের অক্ষমতা, এবং তার কারণেই আমাদের অপরের, অর্থাৎ ধর্ম-পেশার মানুষজনের লেজুড়বৃত্তি করতে হয়। রূপকথার গল্পকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে, পরজন্ম, স্বর্গ-নরকের ভয়-লোভে পড়ে আমরা বিভ্রান্ত হই। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বিষয়ে তিনি স্পষ্ট লিখছেন: “... religious immaturity is the most pernicious and the most dishonourable variety of all.”5 তাঁর আলোকায়ন-প্রস্তাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ধর্ম-বিষয়ে আমাদের সাবালকত্ব অর্জনের প্রসঙ্গ। যুক্তিবুদ্ধির আলোকে আমাদের ধর্ম-চিন্তার এই প্রস্তাব অবশ্যই যুগান্তকারী। আমরা জানি, ধর্মের সমালোচনা করলেও তিনি ধর্মকে অস্বীকার করেন নি। তবে তাঁর ধর্মের ধারণা একবারে অনবদ্য: পৃথিবীতে কেবল একটিই সত্যিকারের ধর্ম আছে, এবং তা হ'ল নৈতিকতার ধর্ম যদিও ইতিহাসে নানা বিশ্বাস একে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্নভাবে (“various historical ‘faiths’ promoting it”)। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি বহু ধর্মের, বিচিত্র বিশ্বাসতন্ত্রের বাস্তবতা স্বীকার করেন। তবে ধর্মের আসল স্বরূপ যে নৈতিকতা এই সত্য সামনে এনে  তিনি এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছেন--একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অবশ্য তিনি মানেন, মানুষের মন উদ্দেশ্যহীন এক অন্ধ জগতের ধারণায় সায় দেয় না। তাই ধর্মের আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তবে, তাঁর মতে, ধর্ম আসলে নৈতিকতা ও উচ্চ মানের আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব মিশেল। তিনি বলতে দ্বিধা করছেন না যে যিনি নৈতিকতায় বড় মাপের উন্নতি করেছেন তার আর প্রার্থনার লাইনে না দাঁড়ানোরই দরকার নেই! বলা বাহুল্য, এই অর্থে ধর্মকে মানতে আমাদের কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এমনকি কথিত এক নাস্তিকও এ অর্থে ‘ধার্মিক’ হতে পারে!

আবার তিনি জ্ঞান ও বিশ্বাসের জগতের সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। (প্রথম ‘ক্রিটিক’-এ ‘প্রিফেসে’ তাই তাঁকে বলতে শুনি: “We must deny knowledge in order to make room for faith.”) আমাদের যুক্তিবুদ্ধির যে কতটা সম্ভাবনা, কতটা ক্ষমতা তা তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই পরবর্তী কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশ-চুম্বী সাফল্যের মুখ আমরা দেখেছি।

যাই হোক, কান্টের আলোকায়ন-প্রস্তাবের সমালোচনাও কম হয় নি। অনেকে, বিশেষ করে আধুনিকোত্তরবাদীরা, সমালোচনা করেছেন এই বলে যে আলোকিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পরবর্তীতে উপনিবেশবাদ তথা দুটি বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, জ্ঞান যে ক্ষমতা এবং তা যে আধিপত্যকারী হতে পারে, যুক্তিজাত ক্ষমতা ও প্রযুক্তি যে যাবতীয় অপর ব‍্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের হেতু হতে পারে কান্ট তা বুঝে উঠতে পারেন নি।

আর একটা কথা উঠেছে, যুক্তিবুদ্ধিকে একবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বরাট হিসেবে বিচার করলে তা যে শেষে জড়বাদী উন্মত্ততায় শেষ হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? নিয়তিবাদই আমাদের নিয়তি হবে না তো?  হিটলার-মুসোলিনির চূড়ান্ত মানব-বিদ্বেষ এই পথ ধরেই প্রাদুর্ভূত হয় নি কি! তৃতীয় আর একটি অভিযোগ, স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ, সামাজিকভাবে অজ্ঞাতনামা বিচার-বুদ্ধির একশিলা ধারণা যথার্থ নয়। আমাদের “রীজন”এর পক্ষপাতহীন সর্বজনীন কোন চেহারা নেই বলে অনেক মনে করেন! চতুর্থত, মানুষের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে কান্ট উদারনৈতিক মানবতাবাদকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (anthropocentrism)-এ রূপান্তরিত করেছেন, যা পরবর্তীতে অপরাপর প্রজাতির প্রতি আমাদের উদাসীন, কখনও বা বিরূপ করে তুলেছে ।

এসব অভিযোগ বা সমালোচনার কতটুকু কান্টকে স্পর্শ করে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। তবে এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই এখানে। যুক্তি-বুদ্ধির আলোকায়ন ও তজ্জাত জ্ঞানকে যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অ-কাজে, অন্যের পীড়নের ব্যবহার করে তার সব দায় আলোকায়নের প্রবক্তার উপর কেন পড়বে তা বোধগম্য হয় না! কান্ট তো কখনও আমাদের যুক্তিবত্তাকে বিচার-বিযুক্ত হয়ে বা নিছক উপায় (means) হিসেবে ব্যবহার করতে উপদেশ করেন নি! বরং কান্ট যুক্তি-প্রজ্ঞার স্বগত মূল্য তথা উদ্দেশ্যেমুখীনতার কথা বলেছেন বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ ক‍রে “Perpetual Peace”-এ। তবে হাঁ, আমাদের যুক্তি-প্রজ্ঞাকে নিরপেক্ষ সর্বজনীন হিসেবে ইঙ্গিত করে বাস্তবের সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব তিনি তৈরি করে দিয়েছেন-এ অভিযোগ একবারে মিথ্যা নয়। আলোচনার পরের অংশে নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কান্টকে, তার আলোকায়ন-তত্ত্বকে বিচার করছি, এবং তখন এই বিষয়ে আরো আলোকপাত ঘটবে।

২

আমরা দেখলাম কান্টের আলোকায়ন-ভাবনার মূলকথা: পরমুখাপেক্ষিতা ঝেড়ে ফেলে নিজেদের যুক্তি-প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে প্রগতির পথে, সাম্যের পথে, পরিপূর্ণ মানবতার পথে এগিয়ে যাওয়া। এর মধ্য দিয়েই স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রজ্ঞাবান মানুষ হিসেবে  আমরা কীভাবে চলব তারও একটা চিত্র আমরা পেয়ে যাই।  কিন্তু আমরা হতোদ্যম হই যখন নারীদের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা, বিশেষ করে তাঁর বিভিন্ন লেখায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচার-বিশ্লেষণ নজরে পড়ে। ক্ষোভ ও বিরক্তি জন্ম নেয় মনে। তাঁর মতো একজন দার্শনিক, যাঁকে আমরা  প্রকৃত অর্থে দর্শনের তন্ত্র-নির্মাতা (system-builder) হিসেবে মস্তকে-হৃদয়ে ধারণ  করি, বলছেন যে নারীরা নাকি নিজের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে চলতে পারে না! মনুষ্য প্রজাতির অর্ধেক সদস্যদের যুক্তিবত্তায় এহেন সন্দেহ আমাদের ব্যথিত করে। কোন কোন কান্ট-বিশেষজ্ঞ, বা বলা ভালো কান্ট-অনুরাগী তাঁর গভীর-দর্শন সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট রচনাসমূহ, বিশেষ করে তিনটি 'ক্রিটিক'-এর গভীর-দার্শনিকতায় মনোনিবেশ করতে উপদেশ করেছেন এরকম খুচরো কিছু কথা-বার্তাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে। আসলে তাঁরা যা বলতে চান, আজকের রাজনীতিকদের ভাষায় বললে, এগুলি হল “বিচ্ছিন্ন ঘটনা!” অন্যদিকে নারীবাদী চেতনায় ঋদ্ধ ব্যাখ্যাকারেদের কেউ কেউ কান্টকে “নারী-বিদ্বেষী” (misogynist) বলতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। এমতাবস্থায় আলোকায়ন-ভাবনার মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না আমরা তাঁর নারী-ভাবনার উপরও আলোকপাত করি। পর্যালোচনার এই দ্বিতীয় অংশে আমরা সে কাজটিই করতে চলেছি।

যদিও আজকের চেতনায়, আজকের পরিভাষায় অষ্টাদশ শতকের দর্শন-বিচার সমীচীন নয়, তথাপি নারীবাদ (Feminism)-র কথা যখন উঠেইছে তখন প্রথম দিকেই এতদ্বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি, কেননা অনেকের কাছেই এই একবিংশ শতাব্দীতেও নারীবাদ বিষয়টি পরিষ্কার নয়। অনেকে আবার এই 'বিদঘুটে' মতাদর্শটি পাশ কাটিয়ে গিয়ে মানববাদ (Humanism)-এ স্বস্তি খোঁজেন। না, ভয় পাবেন না: নারীবাদ মানববাদ-বিরোধী কোনো অবস্থান নয়! মানববাদের সাবেক প্রবক্তারা সকল মানুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদার কথা তুলেও নিজেদের মা-ঠাকুমা বোন-দিদিকে সত্যিকারের সম-মর্যাদা দিতে ইতস্তত করেছেন (ঠিক যেমন আমদের মহান দার্শনিক কান্ট-ও করেছেন বলে মনে হয়)। বা এমনও হতে পারে, নারীরা সমাজের কাছ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ না পেয়ে মূর্ত সমতার দাবির ব্যাপারটি বুঝেই উঠতে পারেন নি। অ্যাক্ট অফ কমিশন বা অ্যাক্ট অফ ওমিশন-- যেকোন কারণেই হোক, নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পায়নি--এটা কঠোর, কঠিন বাস্তব।  নারীবাদ তাই এটা মনে করিয়ে দেয়, নারী-পুরুষ সমান। এই নরলোকে এমন কিছু নেই যে নারী পারে না। নারী-পুরুষের যেটুকু পার্থক্য সৃষ্টিকর্তা বা কর্ত্রী করেছেন তা প্রজাতির চলমানতাকে রক্ষা করার জ্ন্য। এটুকু বৈচিত্র্যকে আমরা বৈষম্যে রূপান্তরিত করেছি, বিদ্বেষে পরিণত করেছি, যার পরিণতি ঐ নির্ভয়া কাণ্ড, আর এই আর জি কর-কাণ্ড! যেসব চিন্তকেরা এসবের পিছনে থাকা ভাবনা তথা বিকৃত মতাদর্শের তত্ত্ব-তালাশ করেছেন, তার থেকে বেরিয়ে এসে সত‍্যিকারের মানববাদের সন্ধান দিয়েছেন তাঁরাই নারীবাদী, আর তাঁদের সুচিন্তিত ভাবনাই নারীবাদ। আর নারীবাদ যেহেতু একটি মতাদর্শ বা বিচারধারা, যা শিখতে হয়, বুঝতে হয়, চেতনায় ধারণ করতে হয়। তাই সব নারীই নারীবাদী, বা সব পুরুষই নারী-বিদ্বেষী- এরকম ব্যাপারটি নয়। নারী শিক্ষা-দীক্ষায় আগে অনেক পিছিয়ে ছিল ছেলেদের থেকে, এখনো হয়তো অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েই আছে। তাই নারীর মধ্যে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব বেশি দেখলে অবাক হবেন না।

এবার আসি যৌন-বিদ্বেষী আচরণধারা (sexism)-র পিছনে ক্রিয়াশীল থাকা পুরুষতন্ত্র (patriarchy)-এ। পুরুষতন্ত্র (কেউ কেউ ‘পিতৃতন্ত্র’ও অনুবাদ করে থাকেন।) বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে দু'একটা কথা এখানে না বললেই নয়। বলা বাহুল্য, আমাদের সমাজের যে সাবেক কাঠামো সেখানে গণপরিসরে কাজ করা পুরুষদেরকেই মূল 'ব্রেড-আর্নার' বলে দেখা হয়, বেশিরভাগ মেয়েরা যেখানে শ্রমমূল্য-হীন গৃহস্থালি কাজেই জীবন কাটিয়ে দেয়। শুধুই অর্থনৈতিক কারণেই নয়, বাইরে তাদের অপেক্ষাকৃত কম দৃশ্যমানতার সুযোগে পুরুষেরা সর্বময় কর্তৃত্বের আদত হয়ে উঠেছে। বুঝে হোক বা না বুঝে, সমাজ এই প্রাধান্য কখনো নীরবে বা কখনোবা সরবে মেনে নিয়েছে। এটাই পুরুষতন্ত্র।

এই পুরুষতন্ত্রও কিন্তু নিরালম্ব নয়। চিন্তা-কর্মের  জগতে যে পুংকেন্দ্রিক ভাবনা (phallogocentrisn)--নারীকে সর্বদা পুরুষের রেফারেন্স-এ বোঝা ও উপস্থাপনের যে সংস্কৃতি—তা জ্ঞান-রাজ্যের মধ্যেও বিরাজমান, এমনকি দর্শনেও। তার ফলেই পুরুষতন্ত্রের গতি এতদিন অপ্রতিহত থেকেছে। নারীবাদ সেই গতিকে থামিয়ে দিয়ে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর বিনির্মাণ চায়। পরিবর্তে লিঙ্গ-বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রস্তাব করে, উদ্যোগী হতে বলে। আর একটি সমগোত্রীয় পরিভাষা অ্যাণ্ড্রোসেন্ট্রিজম (androcentrism)-এর কথা বলতেই হয়। অ্যাণ্ড্রোসেন্ট্রিজম আসলে পুরুষের চোখে দেখা, পুরুষের বিচারে ধরা দেওয়া জগতকে সব মানুষের জগত বলে দাগিয়ে দেওয়ার ভাবাদর্শ। নারীর  অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞানকে এখানে থোড়াই কেয়ার করা হয়! আসলে অধিবিদ্যা তথা সত্তাতত্ত্বের দৃষ্টিতে যা ফ‍্যালোগোসেন্ট্রিজিম জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে তাই-ই অ্যাণ্ড্রোসেন্ট্রিজম।

এবার জ্ঞানরাজ্যের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থানকারী দর্শন তথা দার্শনিকদের মধ্যে ধারণাগত স্তরে তথা তত্ত্বে পুংকেন্দ্রিকতা তথা অ্যাণ্ড্রোসেন্ট্রিজম কীভাবে কাজ করে তার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল হিসেবে কান্টের চিন্তা-চেতনার এখানে পর্যালোচনা করা হবে।

নারীদের প্রতি কান্টের মনোভাব বুঝতে আমরা শুরু করছি অধ্যাপিকা দীপ্তি গঙ্গাবেনের বিশ্লেষণ দিয়ে। তাঁর প্রবন্ধ “Kant on Femininity”-তে তিনি এতদ্বিষয়ক আলোচনা শুরু করেছেন এই বলে যে কান্ট নারীদের সম্পর্কে যেভাবে যে ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁর  রচনার  তাত্ত্বিক বাঁধন, যা আমরা বিশেষভাবে পাই তাঁর “ক্রিটিক”-ত্রয়ের মধ্যে, তা এইসব বিবৃতির মধ্যে নেই। এগুলি বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ, তাদের প্রতি উপদেশ। গঙ্গাবেনের অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে, তাঁর প্রি-ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লেখা “দ্য অবজার্ভেশনস অফ দ্য ফিলিংস অফ দ্য বিউটিফুল অ্যাণ্ড দ্য সাবলাইন” (এবার থেকে শুধু “দ্য অবজার্ভেশনস” নামে উল্লেখিত হবে)-এ তিনি প্রথম নারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। যদিও “অ্যানথ্রোপলজি ফ্রম অ্যা প্রাগম‍দ্যাটিক পয়েন্ট অফ ভিউ” (এবার থেকে শুধু “অ্যানথ্রোপলজি” নামে উল্লেখিত হবে) অনেক পরের দিকে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে রচিত, তথাপি এখানেও তিনি নারী-পুরুষ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকেন নি। স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমাদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এখানেও। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন এগুলি কোনো সিরিয়াস দার্শনিক অভিমত বা তত্ত্ব নয়, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগত সম্পর্কে, নারীকুল সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবহারিক ও চটজলদি অনুজ্ঞা মাত্র। কিন্ত প্রবন্ধকার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে “...they are philosophical texts searching for univetsalities in particulars.”6 (গঙ্গাবেন) এই “অবজার্ভেশনস” এ তিনি নারীত্ব (femininity)-কে পৌরুষ (masculinity) থেকে আলাদা করেছেন, এবং নারীত্বকে স্থির সারধর্ম (essence) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি নারীদের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণাবলীর কথা বলেছেন যা তাদেরকে পুরুষ থেকে চিরতরে আলাদা করে দেয়। তিনি নারীর যুক্তিবত্তাকেই সংশয়-সংকুল করে তুললেন। তারা দর্শন-চর্চার যোগ্য বলেই মনে করেন নি। তিনি নারীকে “ফেয়ার সেক্স” হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার সার্থকতা কেবল সৌন্দর্যে। অন্যদিকে পুরুষকে “নোবেল সেক্স” হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার সার্থকতা মহত্ত্বে। কান্ট স্বয়ং লিখছেন: “Laborious learning or painful pondering, even if a woman should greatly succeed in it, destroy the merit that are proper to her sex and because of their rarity they can make of her an object of cold admiration but at the same time they will weaken the charms with which she exercises her great power over the other sex.”7 এভাবে নারীকে উপস্থাপন করে আলোকায়নের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা কান্ট নারীর আত্ম-নির্ভরতার পথ কি বন্ধ করে দিচ্ছেন না? অধিকন্তু, নারীর বিবাহ-সংস্কারকে তিনি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন, স্বামী ছাড়া নারী-জীবন এমন অকল্পনীয় ভেবেছেন যে বালখিল্ল্যের মতো লিখেই ফেললেন: “For a young wife is always in danger of becoming a widow, and because of this she scatters her charm over all the men whom circumstances might make potential husband for her, so that, should the situation occur, she would not be wanting for suitors.”8

এই “অ্যানথ্রোপলজি”-তে তিনি সভ্য সমাজে নারীর ভূমিকাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন: মানব-প্রজাতিকে চলমান রাখা, আর সমাজকে একটু পরিচ্ছন্ন করে তোলা, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, পুরুষদের উপর যথাসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে একটু মোলায়েম করে রাখা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয় হল, তিনি এতাদৃশ নারীত্বকে তিনি তাঁর “মেটাফিজিক্স অফ মরালস”-এ প্রকৃতিদত্ত অর্থাৎ ন্যাচারাল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এবং পুরুষের উচ্চমন্যতাকে (যার থেকে পুরুষতন্ত্র রসদ পায়) স্বীকৃতি জানিয়ে “the natural superiority of the husband to the wife”-এর যে জয়গান গেয়েছেন তা হতাশাব্যঞ্জক। বেশ কিছুটা বিস্ময়ের সূরে অধ্যাপিকা গঙ্গাবেন মন্তব্য করেছেন, কান্টের মতো এত উচ্চ মানের একজন দার্শনিক যাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও নৈতিক সংহতি বহুল প্রচারিত ও স্বীকৃত, তিনি কীভাবে নারীকে এত হেয় চোখে দেখতে পারেন! কী করে তিনি বলতে পারেন, নারী কোনরূপ বিমূর্ত চিন্তা করতে পারে না, যুক্তি দিয়ে দর্শনচর্চা করতে অপারগ?

আমরা এবার রবিন মে শোট্ট-র প্রবন্ধ “দ্য জেণ্ডার অফ এনলাইটেনমেন্ট”-এর অনুসরণে কয়েকটি কথা বলবো। শোট্ট আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে শুধু মহিলা নয়, চাকর ও ইহুদিদেরও আলোকায়নের কান্টীয় আহ্বানের বাইরে রাখা হয়েছে। আলোকায়ন-বুদ্ধির সর্বময় আধিপত্য (the hegemony of enlightenment rationality)-র সমালোচনার মধ্য দিয়ে নারীবাদীদের কান্ট-পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। অনেক নারীবাদী অবশ্য মনে করেন, এই এনলাইটেনমেন্ট আদর্শের মধ্যেই নারীর ব্যাক্তি-স্বাধীনতা, প্রগতি ও সাম্যের উপাদান ছিল। এর থেকেই নারী বাদ বিকশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নারীমুক্তির যাবতীয় উপাদান নিজের প্রস্তাবের মধ্যে অন্তঃস্যূত থাকলেও কান্ট তার নাগাল পান নি। তৎকালীন সমাজ-চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি তিনি। (কান্টের এহেন আচরণ মার্কসবাদের মৌলিক তত্ত্ব ঐতিহাসিক বস্তবাদ (Historical Materialism)-এর বাস্তবতাকেই সপ্রমাণ করে না কি, যেখানে বলা হয়েছে, চেতনা নয়, আমাদের সামাজিক অস্তিত্বই আমাদের সত্তাকে গঠন করে?) যাই হোক,  এটা ঘটনা যে অনেক নারীবাদী আলোকায়নের ‘ক্রিটিক্যাল র‍্যাশানালিটি’-র উপর ভর করই পুরুষতন্ত্র তথা অ্যাণ্ড্রোসেন্ট্রিজমের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন! বিপরীতে, অনেক নারীবাদী আলোকায়নের মূল প্রতিজ্ঞা তথা প্রস্তাবসমূহকে নারীবাদ-বিরোধী বলে মনে করেন। নারীবাদের যে রাজনীতি ও তত্ত্বায়ন তার সঙ্গে কান্টের এই আলোকায়ন খাপ খায় না। কান্টের আলোকায়ন-প্রস্তাব যে শুধু নারীজাতি, ভৃত্যকুল ও পরোক্ষভাবে ইহুদিদের বহির্ভূক্ত করে তাই নয়, আত্মসত্তা, সত্যতা ও জ্ঞান সম্পর্কে নারীবাদীদের যে ধ্যান-ধারণা তার সঙ্গেও মেলে না। বাস্তব স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জ্ঞান-রাজ্যের এ সবকিছু যখন বোঝার কথা, আলোকায়ন যেখানে ইতিহাস-অতিবর্তী সামান্যের খোঁজেই নিমগ্ন থাকতে চায়। নারীবাদীদের আশঙ্কা, ইতিহাস-অতিক্রমনেচ্ছু এই পদ্ধতিগত অবস্থান শেষ পর্যন্ত কেবল প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা-অভিজ্ঞতাকেই মান্যতা দিয়ে বসে না তো?

প্রবন্ধকার শোট্ট যথার্থ মনে করেন, যে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে কান্টের এই আলোকায়ন-দর্শন জন্ম নিয়েছে তাও বিচার্য। কান্টের সময়কালে মেয়েদের পড়াশোনার রেওয়াজ ছিল না বললেই চলে। তিনি নিজে কোনিশবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, পড়িয়েছেন। আর কে না জানে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই বিজ্ঞান তথা দর্শন-চিন্তার পীঠস্থান! সেখানে তখনও নারীদের শিক্ষা-জগতের বাইরে থাকাটা স্বাভাবিক বলে ভাবা হতো। বাস্তব চিত্র এটাই যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত জার্মানির নারীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন-আদালত ও যাবতীয় সরকারি পদ থেকে দূরে ছিল। কান্টকে যখন আমরা মেয়েদের জ্ঞানগম্য নিয়ে মস্করা করতে দেখি তখন এসব পরিস্থিতিগত তথ্য সামনে রাখতেই হবে।

তবে সব থেকে বিধ্বংসী হল কান্টের এই ব্যক্তিগত অভিমত: নারীকে প্রাকৃতিক চাহিদা দিয়েই সংজ্ঞায়িত করা যায়! এটা ভয়ংকর সমস্যা-সংকুল। নারীকে যদি  স্বভাবগতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণে অপারগ ভাবা হয়, তাহলে পুরুষের লেজুড় বৃত্তি করা, পুরুষের সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে থাকা তার নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। তাই নারীবাদীদের ক্ষোভ একারণে নয় যে তিনি নারীদের পুরুষ-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বলেছেন।তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে থাকা কান্ট একথা বলতেই পারেন। তিনিও তো মানুষ, আমাদের থেকে একটু বেশি বুদ্ধি ধরেন-এটুকুই যা পার্থক্য। তাঁদের হতাশা ও বিরক্তি ঠিক এই কারণে যে তিনি নারীর পশ্চাদপদতাকে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে না খুঁজে নারীর স্থায়ী স্বভাব (fixed nature) বলে দেগে দিলেন! আবার এমনটাও নয় যে কোন ব্যতিক্রমী নারী তখন দৃশ্যমান ছিলেন না। এমিলি ডি চ্যাটেলেট পূর্ণ সময়ের বিজ্ঞান-সাধনার জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা ও সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অন্য এক বিদুষী নারী ম্যারিয়া ভন হার্বাট পড়াশোনার উপযুক্ত সুযোগ না পাওয়ায় গভীর মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। আরও বেদনা দায়ক এদের জন্য “আলোকিত” কান্টের কোন সমবেদনা ছিল না। উল্টে মারিয়ার অবস্থাকে  “মেন্টাল ডিরেঞ্জমেন্ট” বলে তিনি অভিহিত করে বসলেন! আসলে কান্ট আমাদের যুক্তিবুদ্ধি বা 'রীজন'-কে “a universal ahistorical faculty” হিসেবে বুঝতে গিয়েই আলোকায়ন-প্রস্তাবের মূল অভিমুখ বুঝতে নিজেই ব্যর্থ হয়েছেন। কান্ট তাই (কথিত “আলোকায়নের বিদ্রোহী সন্তান”) মার্কসের কাছে হেরে গেলেন বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।

কান্টের বিচারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীবাদীরা সামনে এনেছেন, এবং তা হ'ল যুক্তিবুদ্ধির কোনো প্রয়োগ তখনই স্বীকার্য হবে যখন তা যাবতীয় আবেগ-অনুভূতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে নিতে পারবে। তিনি অবশ্য যুক্তি প্রয়োগে “সাহস” (courage) এবং নৈতিক বিধির প্রতি “শ্রদ্ধা” (respect)-র কথা বলেছেন। এই অনুভূতিকেও আবার “self-wrought by a rational concept” হতে হবে! যুক্তি-প্রজ্ঞার সার্বভৌমত্বে কোনো আপোষ চলবে না! কান্টের এই কথিত নিরপেক্ষ যুক্তিবুদ্ধিকে আইরিশ ইয়াং “solitary transcendent” বলেছেন যা এই জগতের কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির দৃষ্টিকোণকে স্পর্শ করে না।9 সোনায় খাদ না মেশালে যেমন গহনা তৈরি করা যায় না, তেমনি “ডিসএম্বডিড রীজন”-এও কোনো কার্যসিদ্ধি হয় না। লুসিডেন গোল্ডম্যান আবার মন্তব্য করেছেন, কান্ট তৎকালীন বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের বাইরে বেরুতে পারেন নি, তাই “আমি” থেকে “আমরা”-য় পৌঁছতেই ব্যর্থ হয়েছেন!10

আসলে কান্ট এখানে যে নিরপেক্ষ গণপরিসরের কল্পনা করছেন তা তাদের চাহিদামতো সমগোত্রীয় নাগরিকদেরই স্থান দিতে পারে। যারা ঐ মডেলে যারা ফিট করে না, যেমন বিশেষ মনোযোগের দাবিদার মেয়েরা, তাদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ফলত, এই গণপরিসর শেষমেষ ক্ষমতাবান পুরুষের তন্ত্রে রূপলাভ করে।

আগেই বলা হয়েছে, কোনো কোনো ব্যখ্যাকার বলছেন, নারীদের উপর করা কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবচনকে পাশে সরিয়ে রেখে কান্টের দার্শনিকতার গভীরে অনুসন্ধান করলে তাঁকে “নারী-বিদ্বেষী”-র তকমা থেকে রেহাই দেওয়া যায়। তাঁদের তরফে আমরা এখানে দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারি: একটি প্রথম “ক্রিটিক”-এ “ট্রানসেনডেন্ট্যাল ইউনিটি অফ অ্যাপারসেপশন”-এর প্রসঙ্গ, যেখানে তিনি বলছেন “I think accompanies all of my representations.” “I think”-এর এই আমিকে বোঝাতে তিনি লিখছেন “this I or He or It that thinks.” 11 এই “আমি”-কে কান্ট কী করে কেবল পুরুষের মধ্যে সীমিত করে রাখতে পারেন? দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গ তাহল দ্বিতীয় “ক্রিটিক”-এর নিশর্ত অনুজ্ঞার দ্বিতীয় বয়ান: “So act as to treat humanity, whether in thine own or in that of any other in every case as an end withal, never as means only.”12 “উদ্যেশ্য-রাজ্য” (a kingdom of ends)-এর বাসিন্দা মহিলাদের কখনও নিছক উপায় হিসেবে ভাবা যায়! পুরুষের সঙ্গে নারীরাও এক একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানবসত্তা। অতএব কান্টের বিরুদ্ধে নারী-বিদ্বেষের অভিযোগ নিয়ে এত হইচই করার কিছু নেই।

কিন্তু এসব প্রসঙ্গের অবতারণায় 'অর্ধেক আকাশ' নারীর প্রতি তাঁর মনোভাব সমর্থিত হয় কি? কান্টের দার্শনিক মহত্ত্ব স্বীকার করেও আমি বলব, ব্যক্তি কান্টকে তো নয়ই, দার্শনিক কান্টকেও নারীবিদ্বেষের অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া যায় না।

**তথ্যসূত্র**

1. Immanuel Kant. “What is Enlightment?”. *Kant: Political Writings* (tran. H.B. Nisbet & ed. HS Reiss). Cambridge: Cambridge Universty Press, 1970, p.54.
2. Ibid. p.56
3. Ibid. p. 58
4. Ibid.
5. Ibid. p.59
6. Deepti Gangabane. “Kant on Femininity”. *Indian Philosophical Quarterly*. Vol. XXI, Nos.I to IV, 2004, p. 360
7. Immanuel Kant. *Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime* (tran. John T. Goldthwait). Berkeley: University of California Press, 1960, pp.77-78.
8. Immanuel Kant. *Anthropology from a Pragmatic Point of View* (tran. MaryJ. Gregor). The Hague: Martinus Nijhoff, 1974, p.168.
9. Iris Young. “Impartiality and the Civic Public: Some Implications of Feminist Critiques of Moral and Political Philosophy.” In her ed. *Thwrowing Like a Girl and Oher Essays in Feminist Philosophy and Social Theory*. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 96.
10. Luciden Goldmann. *Immanuel Kant* (tran. Robert Black). London: The Left Books, 1971, p.170.
11. Immanuel Kant. *Critique of Pure Reason*. (tran. N. K. Smith) London: Macmillan & Co. p. 331। [(A346/B404)]
12. Immanuel Kant. *Critique of Practical Reason* (tran. T. K. Abbott) London: Longmans, 1889, p. 47.

নিচের প্রবন্ধ দুটিও আমাকে এই লেখাতে সাহায্য করেছেঃ

Robin May Schott. “The Gender of Enlightenment”. *Feminist Interpretations of Kant* (ed. Robin May Schott). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1997.  
Kurt Mosser. “Kant and Feminism”. *Philosophy Faculty Publication*, 21, 1999.  <https://ecommons.udayton.edu/phl_fac_pub/21>